শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় জ্যোতির্ময় রায়
প্রয়াণ ২৭শে জুলাই, ২০১৯

প্রয়াত জ্যোতির্ময় রায় (আমাদের সকলের প্রিয় জ্যোতির্ময়দা) একটি ভারতীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জাপানি শাখার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে প্রথমে কোবে এবং তারপরে টোকিওতে সস্ত্রীক দীর্ঘকাল বসবাস করেন। স্ত্রী সীতা রায়ের (আমাদের সীতাদি) অসুস্থতার জন্য ২০০২ সাল নাগাদ ভারতে ফিরে যান। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার জ্যোতির্ময়দা ছিলেন একজন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ এবং নানারকম বিরল গুণের অধিকারী। Bird watching এবং ছবি আঁকা ছিল তাঁর অন্যতম শখ। এছাড়া লিখতেন অসাধারণ কবিতা ও গল্প। ভারতে ফিরে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন স্ত্রী সীতাদির শিল্পকর্মকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার কাজে। ২০০৭ সালে সীতাদির মৃত্যুর পর শুরু হয় তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন। তবুও তিনি কর্তব্যে বিরত থাকেননি। জাপানে এসে সীতাদির ছবির প্রদর্শনী করে গিয়েছেন। নিজের চিগিরি আর্টের প্রদর্শনীও করে গিয়েছেন জাপানে।

বারো বছরের নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে এই বছর জুলাই মাসের ২৭ তারিখে জ্যোতির্ময়দা চলে গেলেন অমৃতধামে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী সীতাদির কাছে।

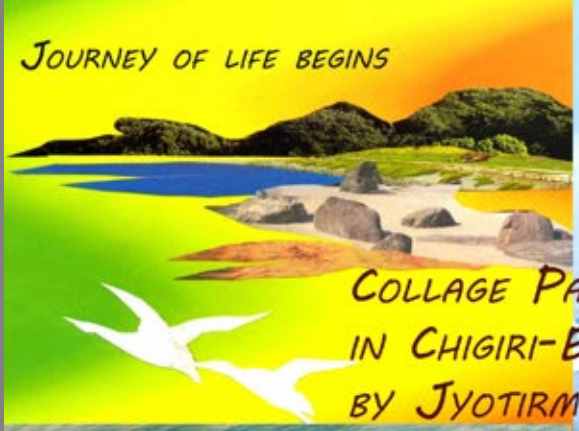

Collage Paintings in Chigiri-E Style by Jyotirmoy Ray

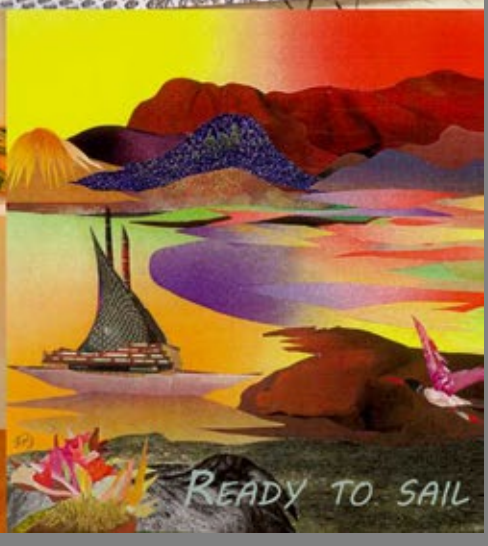

জ্যোতির্ময়দাকে স্মরণ করে

- রঞ্জন গুপ্ত

ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে
সকালের জানালায় তোমাকে অনেক দূরে রেখে
সঙ্গীহীন সময়ের টিয়ে
উড়ে গেছে। এই সব দেখে
ক্লান্ত লাগে। এখনি বোধহয়
দুবলাবেরার ওই জলের বিস্তারে
রাত শেষ হয়,
ডানা ঝাপটিয়ে বুনো হাঁস ওড়ে,
ঘন নীল সবুজের ছাপানো পাহাড়ে
শাল আর মহুয়ার বন
জলের আয়নায় স্থির হয়ে থাকে।।

নিজের কি ভালো লাগে সব সময় আমি সেটা খুব ভালো করে গুছিয়ে ভাবতে পারি তা নয়। কিন্তু অনেক সময় অন্য কাউকে দেখে আমার ভালো লাগার দিকগুলো কি, তার যেন কিছু হদিশ খুঁজে পাই। কারণ তাঁদের জীবনে সেইসব দিকগুলির সার্থক এবং পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাই। জ্যোতির্ময়দা (প্রয়াত জ্যোতির্ময় রায়) আমার কাছে ছিলেন তেমনি এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। প্রথম আলাপের সময় থেকেই তাঁর প্রতি জন্মেছে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। যে কোন বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ, অনুভূতিপ্রবণ যুক্তিবাদী মন, এবং সহজাত শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীসহ বহুমাত্রিক প্রতিভা আমাকে বিস্মিত করেছে। যখনই ওনার সান্নিধ্যে এসেছি, তখনই দেখেছি উৎকর্ষতা কাকে বলে তার বিরল দৃষ্টান্ত। গাম্ভীর্যের অন্তরালে ছিল তাঁর অগ্রজসুলভ এক স্নেহ, মায়া মমতায় ভরা মন যার আনুকূল্যে আমি ধন্য।

ওনার সাথে আলাপের প্রথমদিকে আমাদের কাছে কিছুটা বেশি প্রাধান্য পেয়েছিলেন সীতাদি, (জ্যোতির্ময়দার প্রয়াত স্ত্রী) যার বিভিন্ন গুণাবলীর কথা আমরা আগে থেকেই অবগত ছিলাম। সীতাদি, কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকায় জাপান সম্পর্কে লেখালেখি করতেন, খুব ভালো ছবি আকতেন, এইসব কথা ওঁদের সাথে পরিচয়ের আগে থেকেই জানা ছিল আমাদের। যা জানা ছিল না তা হোল সীতাদির সাফল্যের পিছনে জ্যোতির্ময়দার কি অসাধারণ অবদান। সীতাদির প্রতিটি সৃষ্টি জ্যোতির্ময়দার পূর্ণ সহযোগিতায় পেয়েছে এক নতুন মাত্রা। বিভিন্ন সময়ে সীতাদির আঁকা ছবির ভাবের যে ব্যাখ্যা জ্যোতির্ময়দার কাছ থেকে শুনেছি তাতে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে যে জ্যোতির্ময়দাও সমমানের শিল্পী ছিলেন।

অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে জ্যোতির্ময়দার কাছে গল্প শুনেছি পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে উড়ে আসা যাযাবর পাখীদের দেখার অভিজ্ঞতা। মনে পড়ে যায় কি অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছিলেন অঞ্জলিতে পাঠানো Cheering Up শিরোনামের এক ছবিতে। আলাদা করে বুঝিয়েছিলেন ছবিটির ব্যাখ্যা..... Here the theme is that the Flying Birds are Migratory Ducks water birds that fly for nesting and breeding from ice cold Siberia to warmer Lakes at southern hemisphere where weather is warm, plenty of food is available and ambience is suitable for raising their chicks. The Flowers down below are cheering them up on their long distance flight across land and sea.

মনে পড়ে ২০১৫ সালের অঞ্জলিতে এমনই আরো একটি ছবি দিয়েছিলেন Tagore and Cormorant এই শিরোনামে। আলাদা করে ছবিটির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন This painting depicts Tagore's love for the tranquility of nature. Cormorant at a little distance is seen worshipping Tagore leaving aside its avian instinct for preying fish in such a calm and quiet morning when the sun is about to rise. All around the landscape there is a distinct mood of serenity and peace.

যতবার এই ব্যাখ্যাটি পড়ে ছবিটির দিকে তাকিয়েছি ততবারই মনের মধ্যে এক অনির্বচনীয় অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

নিয়মিত ভাবে গল্প, কবিতা এবং ছবি দিয়ে অঞ্জলিকে সমৃদ্ধ করেছেন। ছোটদের এবং বড়দের জন্য অতি উন্নত মানের গল্পও লিখেছেন অঞ্জলিতে। এসব ছাড়াও লিখেছেন অনবদ্য কবিতা। ২০০৭ সালে সীতাদির মৃত্যুর পর যখন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন তখন প্রাণাধিকা প্রিয় স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখেছেন...

নিঃসঙ্গ জীবনের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর ভগ্নহৃদয়ে আবার উঠে দাঁড়ান জ্যোতির্ময়দা তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার তাগিদে। হাতে নেন কঠিন প্রকল্প। দিল্লী থেকে সীতাদির আঁকা বিভিন্ন ছবি নিয়ে এসে টোকিওর ভারতীয় দূতাবাসে ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন, যে অনুষ্ঠানে উন্মোচন করা হয় সীতাদির লেখা "জাপান দেশে আমার ঘরে" পুস্তিকাটি। অমানুষিক পরিশ্রম করেন একটি অতি উন্নতমানের অনুষ্ঠান আয়োজনে। সীতাদির প্রকল্পটি সফল ভাবে শেষ করার পর নিজে শুরু করেন চিগিরি আর্ট, যা বিভিন্ন কাগজ কেটে বানানো হয়। পরবর্তী প্রকল্প নিজের সৃষ্টি চিগিরি আর্টের প্রদর্শনী। তাও সম্পন্ন হোল অত্যন্ত সাফল্যের সাথে। সব কাজ যখন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হোলো, তখন বেজে উঠেছে ছুটির ঘন্টা। দীর্ঘ বারো বছর নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের পর আবার প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পাড়ি দিলেন অমৃতলোকে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেলেন এক সার্থক ও পরিপূর্ণ জীবনের দৃষ্টান্ত।

আমার পড়ার টেবিলের পাশে সযত্নে রাখা রয়েছে জ্যোতির্ময়দার দেওয়া একটি মূল্যবান উপহার। ওনার নিজের হাতে আঁকা একটি ছবি। গাছের ডালে বসে থাকা একটা নিঃসঙ্গ পাখী। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় ডানা ঝাপটিয়ে পাখীটা কোথায় চলে গেল নিঃসঙ্গতার বেড়াজাল থেকে মুক্তির পথে বিস্তৃত দিগন্তের দিকে। উঠে গিয়ে দেখে আসি ছাদে রাখা ফার্ন গাছটাকে। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি সত্বেও যেন আরও সতেজ হয়ে উঠেছে গাছটা। জ্যোতির্ময়দা ও সীতাদির দেওয়া গাছটা তাঁদের বহু স্মৃতি বিজড়িত আর এক মূল্যবান উপহার।

জ্যোতির্ময়দাকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।।

সমুখে শান্তি পারাবার

- সৌগতা মল্লিক

দুপুর নাগদ খবরটা পেলাম। জ্যোতির্ময়দা চলে গেলেন। বয়স এগিয়ে গেলে এই ধরনের খবর আসবে, এ কথা মন মেনে নেয়। তবু মনে হল এত তাড়াতাড়ি, এত পর পর কেন হারিয়ে যাচ্ছেন অনেকে। করবীদি, মঞ্জুলিকাদি, এবার জ্যোতির্ময়দাও তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

জ্যোতির্ময়দার সঙ্গে পরিচয় টোকিও শহরে। প্রায় সাড়ে নয় বছর ছিলাম টোকিওতে। তার অনেকটা সময় জ্যোতির্ময়দার সাহচর্য আমরা পেয়েছি এই শহরে।

অনেক গুণসম্পন্ন, রাশভারী, গুরুগম্ভীর মানুষ। অতএব জ্যোতির্ময়দাকে সম্ভ্রম করে চলতাম। বলতে দ্বিধা নেই যে বেশ ভয় পেতাম। একটি ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে যা আমার এই ধারণা অনেকটাই বদলে দিয়েছিল। তখন ওতা কু'তে থাকি। জ্যোতর্ময়দাও একই অঞ্চলে থাকতেন। দূর্গা পূজার অনুষ্ঠানের জন্য গানের সিডি'র কয়েকটি কপি করে দিতে বলেছিলেন। যথাসময়ে সিডি পৌঁছে দিতে গেছি। অবাক হয়ে গেলাম তাঁর আতীথেয়তা দেখে। দু তিন রকম রান্না করে রেখেছেন আমার জন্য। আমার মেয়ের তখন তিন-চার বছর বয়েস। তার জন্য আইসক্রিম, চকোলেট টেবিলে মজুত। কত সহজভাবে গল্প করলেন। পরিবারের সকলে কেমন আছেন, কাজ কেমন চলছে, ভারতবর্ষের রাজনীতি ইত্যাদি কত গল্প। খুব সুন্দর সময় কাটলো। নিজেই আশ্চর্য হলাম। অবাক হয়ে ভাবলাম এতটা সময় আমি জ্যোতির্ময়দার সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি? তাঁর স্নেহময় চরিত্র সম্পর্কে এক অন্য উপলব্ধি নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

পয়লা বৈশাখের পর রীতাদি শ্যামলদার ইয়োকোহামার বাড়ীতে রবিবার দুপুরে নিমন্ত্রণ। সে সময় আমরা টোকিওতে থাকতাম। ভারতীয় বাঙ্গালীর সংখ্যা তখন অল্প। যে কোনো নিমন্ত্রণ বা অনুষ্ঠানে তাই সকলে একসঙ্গে উপস্থিত থাকতাম। সেবার রীতাদি নিমন্ত্রণের বিশেষ আকর্ষণ রেখেছিলেন বড় বড় চিংড়ি মাছ। অসংখ্য চিংড়ি ও দারুণ রান্না। অলর্ক ও তথাগত (এখন টরোন্টো-কানাডা বাসী) প্রতিযোগিতা করে চিংড়ি খেয়েছিল। একদমে অগুনতি চিংড়ি খেয়ে দু'জনেই শারীরিক ভাবে বিপর্যস্ত। শ্যামলদার সোফায় দুজনেই শুয়ে পড়েছে। খুব হাসি আর হৈ হৈ চলছে এই নিয়ে। গৌতমদা, পুলকদা অনেক মজার চুটকি শোনাচ্ছেন ও সবাই উপভোগ করছি। জ্যোতির্ময়দাকে দেখেছি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কি ভীষণ সংযম আর কিরকম নিয়ম মেনে চলতেন। কিন্তু এই সুন্দর পরিবেশ জ্যোতির্ময়দাও উপভোগ করেছিলেন। সেদিন তাঁর একটি নতুন রূপ আবিষ্কার করেছিলাম। অনেক দেরি পর্যন্ত ছিলেন যতক্ষণ না তারা সুস্থ বোধ করছে। জ্যোতির্ময়দার অনুরোধে রুমাদির কণ্ঠে অভাবনীয় আবৃত্তি দিয়ে দিন শেষ হয়েছিল।

ভারতবর্ষের সূত্র ধরে জ্যোতির্ময়দার সঙ্গে সংযোগ বহু বছর ছিল। আমার পরিবারবর্গ মূলত দিল্লী ও রাঁচী প্রবাসী। জ্যোতির্ময়দা টোকিওর পরে দিল্লীতে বসবাস করতেন। রাঁচী যাতায়াত করতেন আত্মীয় পরিজনের কাছে। তাই ভারতবর্ষে গেলে একাধিকবার জ্যোতির্ময়দার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। ভাল লাগতো তাঁর অবসর জীবনের রুটিন দেখে। প্রাতঃভ্রমণ থেকে শুরু করে অঙ্কন শিল্পের মধ্য দিয়ে নিজেকে শান্ত ও ব্যস্ত রাখতেন। জ্যোতির্ময়দার সঙ্গে শেষ সাক্ষাত গতবছর ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে, তাঁর দিল্লীর বাড়ীতে। শারীরিক দুর্বলতা চোখে পড়েছিল। তবুও যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে গল্প করেছিলেন। টোকিওর অনেক স্মৃতি রোমন্থন করেছিলেন। কোবে শহরও ছিল আলোচনায় বহুবার। অনেকটা সময় কাটিয়ে সুন্দর অনুভূতি নিয়ে বাড়ী এসেছিলাম।

যখন কোনো প্রিয়জন বা পরিচিতজনের মৃত্যুর খবর আসে, তা বেদনা দেয়। মনে হয় যেন হঠাৎ অনেক কিছু হারিয়ে গেল। জ্যোতির্ময়দার কথা লিখতে গিয়ে এক নতুন উপলব্ধি হল। মৃত্যুতে চোখের সমুখে সেই মানুষকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই প্রিয়জনের সান্নিধ্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের স্মৃতি তো হারিয়ে যায় না। তা না হলে এতদিন পরে এত কথা, এত ঘটনা কি করে একসঙ্গে মনের মধ্যে ভিড় করলো। সরাসরি দেখতে না পাওয়ার দুঃখ থাকবেই। তবে তার সঙ্গেও থাকে সেই সব মধুর স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা যা নিজের জন্যে এক অমূল্য উপহার। যেমন তাদের উপস্থিতি একদিন আনন্দ দিয়েছিল, আজ তাদের অনুপস্থিতি তেমনি অনুপ্রাণিত করছে আমাদের আগামী সুন্দরতর দিনের আশায়।

বোধহয় সেইজন্যেই আজও হারাইনি আমাদের প্রিয় বন্ধু বাবলী ও ভোলাদাকে, শ্রদ্ধেয় করবীদি, মঞ্জুলিকাদি ও জ্যোতির্ময়দাকে।

Jyotirmoy da

- Rita Kar

As far as I can remember, it was towards the end of 1989 or early 1990, we got a phone call from Jyotirmoy da, “Ami Jyotirmoy Ray bolchi”. He introduced himself as B.E College alumni, representing M.N.Dastur here in Japan. He said he had received our contact details from an acquaintance in Kolkata and said to Syamal I am your “Dada” in the right of being your senior at college. Jyotirmoy da and Sita di had already been living in Japan, already for quite a few years in Kansai and had just moved to Tokyo. He invited our family along with Manas and Sushmita Sen’s to their home in Gyotoku.We spent a very pleasant afternoon with him and Sita di and both of them came to see us off at the station. And that is how began a memorable relationship with Jyotirmoyda and Sita di. They moved to Magome after a couple of years and opened up their house for addas with lunch or dinner, rehearsals or meetings, they being the perfect hosts.

Witty and with a great sense of humor, never failing to voice his opinions clearly, Jyotirmoyda spoke softly and laughed a hearty low volume laugh. Never was he dressed casually, always well groomed and a cap on his head. He was very regimented about his diet and chose to be very meticulous about following his daily routine. Punctuality and Jyotirmoy da went hand in hand.

Jyotirmoy da was very knowledgeable and his interests were manifold. Apart from his professional work he was a very good artist, had great appreciation of Western Classical music a food connoisseur and knew a lot about beverages. Another hobby that he truly enjoyed was, bird watching. He started learning Yoga at a later age from Hanari San and ardently practised it. After Sita di’s demise, he became interested in the Japanese art of Chigiri-e and perfected it to the point that he held solo exhibitions in Kobe and New Delhi. Jyotirmoy da silently sketched and surprised us with his sketches, here’s one

that he did of me at our house during a rehearsal.

Jyotirmoy da and Sita di had met while they were both studying art. We all knew Sita di as an artist and her paintings adorned the walls of their house. Jyotirmoy da’s artworks, which were quite remarkable, were also there but hung in silent corners. Probably his love for Sita di and his admiration of her work never made him take the center stage. Although Sita di had held a couple of art exhibitions in Tokyo, after Sita di passed away Jyotirmoy da left no stone unturned to release Sita di’s book in Tokyo and hold an exhibition of Sita di’s paintings posthumously. Incidentally, this was the first event at the Indian Embassy’s newly constructed Vivekananda Culture Center in Tokyo. Putting in a few lines from a long message that we hold very dear to us, that he sent to us after the exhibition -

“Back to pavillion on Nov 30 morning. My mind is filled with memories of the days in Tokyo. One of the most pleasant one is the day I spent with you and Rita. Events of Oct 30 brought us together many times reminding me of the invaluable contributions you two made in making the event a successful one. I appreciate your liaison with the Embassy and securing so

much help from them. Organizing the opening songs for the program and making all the arrangements for inauguration of Sita's paintings, done by Rita, was excellent. Of course not to mention about your whole hearted encouragement for taking up the project and initiative to make it a success. Looking back to the execution of the events, I really have a great feeling of satisfaction."

Poolak Banerji and his wife Papiya, from Singapore writes, "We met Jyortirmoy-da when we moved to Japan in 1997. Few common things among us – both were from BE College and both worked for Dasturco (he was still in Dasturco Japan). He was dada to everyone though he was a fatherly figure. What a wonderful couple he and Sita-di were – full of life and energy. Although much senior to me in BE College scale he never made us feel that way, his subtle humour and sincerity made him a default guardian to many people, surely to my family."

Raja Ghosh, from USA says "From outside he (Jyotirmoy da) looked very serious and intimidating but once you got closer to him you would realize he was very affectionate."

Sanjib and Meeta Chanda also have a similar story to share about receiving their share of love and affection from Jyotirmoy da and Sita di. As they recall, "Jyotirmoyda used to call me Sensei as I introduced digital camera to him. We went together to shops in Akihabara to buy a digital camera. Then I went to their house where I explained and demonstrated Jyotirmoy da how to take pictures of Sita di's art and to save on a computer, Sita di cooked delicious meal for me.

Jyotirmoy da always reminded that Meeta very much resembled his mother. He stressed "Sotti Bolchi! Biswas hocche na? Album dekhate pari" (Really! You don't believe? I can show you the album). Jyotirmoy da and Sita di will always remain in our hearts."

Anirvan Mukherjee portrays Jyotirmoy da in almost the same lines - "In my limited interactions with Jyotirmoy da - I found him to be a very meticulous person who was deeply caring as well. Despite our age difference - he had the ability to connect & make me feel at ease."

Jyotirmoy da, you had touched many hearts with your love and affection, we are fortunate to have known you and Sita di. ■

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয়া মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)
প্রয়াণ ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রয়াত মঞ্জুলিকা হানারির (আমাদের সকলের প্রিয় মঞ্জুলিকাদি) শৈশব কেটেছে ভারতের বিভিন্ন শহরে এবং অবিভক্ত ভারতের করাচী ও সিন্ধ হায়দ্রাবাদ শহরে যা এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত। স্বাধীনতার পর চলে আসেন প্রথমে দিল্লী এবং তার পর কলকাতায়। ১৯৬৪ সালে হানারি সানের (আনন্দদা) সাথে বিবাহের পর জাপানে বসবাস শুরু। একদিকে যেমন স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে সম্পূর্ণ জাপানি রীতিনীতিতে নিষ্ঠার সাথে সংসার করেছেন, তেমনি আবার মনপ্রাণ দিয়ে আজীবন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চাতেও যুক্ত থেকেছেন। দুই সংস্কৃতির মধ্যে এই অবাধ বিচরণ এক বিরল দৃষ্টান্ত। স্বামীর যোগাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। কাজের ফাঁকে লেখালেখি করা ছিল তাঁর একটি প্রিয় শখ। অঞ্জলির জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর লেখা পাঠকদের আনন্দ দিয়েছে।

モンジュリカ追悼文

－ 羽成 すなお

こんにちは。

ぼくは羽成モンジュリカの息子、すなおと言います。

まず始めに、2月に葬儀に来ていただいた皆様、そして4月に母のために偲ぶ会を開いていただいたBATJの皆様に、心より感謝申し上げます。

皆さまから、母との思い出をたくさん聞かせていただきました。ぼくの知らないようなことがたくさんあり、また、多くの人に愛されていたことを知り、とても嬉しく思いました。

母はコルカタで父と結婚し、1964年の東京オリンピックの年に日本に来ました。当時はインド人が珍しかったようで、街でサインを求められたこともあったようです(笑)。

若い頃はTVに出たり、インド料理を教える教室を開いたり、日本に学校でインド文化を伝える講座をしたり、アクティブに行動し、様々なことにトライして、楽しく過ごしていたようです。

一方で3人の子供を育て、父の仕事を支え続けました。父と母の人生の結晶ともいえるヨーガ教室を、今は僕ら夫婦が継承しています。

母は80歳で他界しました。3年半前に父を亡くしてから寂しかったと思います。あと10年は生きると思っていましたが、いきなり体調を崩し、そのまま亡くなってしまいました。日本ではヒンドゥ式の葬儀が出来ず、仏教式に葬儀を行うしかありませんでした。葬儀に来たインド人の皆様は戸惑われたかもしれません。でも母は生まれて死ぬまでヒンドゥ教だったので、ヒンドゥ式に何か供養をした方が良いと思っていました。

生前、

「もし私が死んだらキレイなところに流して欲しい」と母は言っていました。だからせめてガンガーの上流に遺灰を流しに行こう考えました。父の遺灰も一緒に。

そういうわけで

8月8日～16日までインドへ行きました。

目的の地はバドリナート。

そこでヒンドゥ式にセレモニーをすることにしました。

リシケシから車で計14時間(途中1泊)。いまの雨の季節はとても危険な道のりで、土砂崩れがあれば道がふさがり、最悪、たどり着けないリスクもありました(10日前は土砂災害による死亡事故もあり)。

そんななか、僕らが通る道はことごとく晴れ渡り、無事に到着しました。違う時間では同じ道で豪雨や土砂崩れも起きていたようで、ホントに幸運としか言いようがありませんでした。

そうしてバドリナートでセレモニーをしました。

儀式をしてくれたバラモンに、亡くなった人のことを思い出して祈るようにと何度も何度も言われました。その祈りのなかで、父母の良い記憶がたくさん思い出され、感謝と敬意の気持ちにあふれました。

僕はこの8年間、父と母の病老死に深く関わりました。その期間はとても悲しく辛い思い出ばかりで、その思い出ばかりが父母の記憶として、僕のなかに印象つけられていました。

しかし、その儀式の祈りのおかげで、父母のたくさんの良い思い出が強く思い出され、辛く悲しい記憶が流れて行きました。そして晴れやかな気持ちで、アラクナンダー川に父母の遺灰を流すことが出来ました。

無事に、儀式を終え、目的を達成できて本当に良かったです。母に関わった皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

Hello.

I am Sunao, son of Manjulika Hanari.

I would like to express my heartfelt thanks to everyone who came to the funeral in February and to BATJ for arranging a memorial meeting for my mother in April, 2019.

I heard about many memories of my mother from everyone. I was very happy to know that my mother was loved by so many people.

My mother married my father in Kolkata and came to Japan in 1964, the year of the Tokyo Olympics. At that time, Indians in Japan were rare, and she was often approached by curious people to collect her signature (laughs).

When she was young, she appeared on TV, started a class to teach Indian cuisine, gave a lecture on Indian culture at a school in Japan, and was actively engaged in many such activities. On the other hand, she raised three children and continued to support my father's work. Now I have inherited the yoga school that was the fruit of my parents' life-long effort

My mother passed away at the age of 80. I think she was very lonely after she lost her husband three and a half years ago. I was hoping that she would live for another 10 years, but suddenly she fell sick and passed away. In Japan, Hindu style funeral was not possible, and there was no choice but to do the funeral in Buddhist style. Indians who came to her funeral may have been confused.

But my mother was a Hindu ever since she was born, so I thought it would be better to do something in the Hindu style.

Before she died, she said, "When I die, I would like my ashes to be scattered in a beautiful place." So, I thought that at least I should scatter my mother's ashes into the Ganges. That is why I went to India from August 8-16, 2019. I decided to perform my mother's last rites at Badrinath.

The journey took 14 hours by car from Rishikesh (I stayed overnight at a place on the way). The rainy season made the roads very dangerous, and if there were a landslide, the road would have been closed, and there was a risk that the destination could not be reached (there was a fatal accident due to a landslide just 10 days ago). Even under such circumstances, the road we all went through was clear and we arrived safely. There were apparently heavy rains and landslides on the same road at different times previously, so I was lucky.

I performed the last rites at Badrinath. The Monk, who helped me perform the ritual, told me over and over again to remember and pray for the person who died. In that prayer, I recalled many a good memories of my parents and remembered them with gratitude and respect.

I have been deeply involved in the passing away of my father and mother during the past eight years. During that period, there were many sad and painful moments that remained engraved in my mind as memories of my parents.

However, thanks to the ceremonial prayers, many good memories of my parents were fondly and intensely remembered, flushing away the painful and sad ones. With a refreshing feeling, I was able to scatter my parents' ashes into the Alaknanda River.

It was really nice to complete the ritual and achieve the purpose. I am grateful to everyone who had been involved with my mother. Thank you very much. ■

লেখিকা মঞ্জুলিকাদি

- রুমা গুপ্ত

একটু সংকোচ হলেও ফোনটা করতাম।

হ্যালো মঞ্জুলিকাদি,

"কে কথা বলছো? ও রুমা? কেমন আছো? আমি ক'দিন ধরেই ভাবছি তোমার ফোন এলো বলে। এমনিতে তো আর মঞ্জুলিকাদি'কে মনে পড়ে না"।

জুন জুলাই মাসের কোনো এক দিন এরকম একটি টেলিফোন সংলাপ ছিল আমার আর মঞ্জুলিকাদির মধ্যে প্রতি বছরের নিয়মিত ব্যাপার। আমি টেলিফোন করতাম "অঞ্জলি" পত্রিকার জন্য লেখা দিতে অনুরোধ জানিয়ে, কিছুটা স্বার্থপরের মতই কারণ অন্য সময়ে মঞ্জুলিকাদির কুশল জানতে চেয়ে ফোন আমার খুব কমই করা হোত। তাই তিনি সঙ্গত কারণেই অনুযোগ করতেন। প্রতিবারই আমি ক্ষমা চেয়েছি, তারপর কিছু লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি।

তিনি কখনো নিরাশ করেননি । প্রতি বছরই অঞ্জলির পাঠকরা তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়েছে সাবলীল ভাষায় সুলিখিত গল্প প্রবন্ধ রম্যরচনা ইত্যাদি। মঞ্জুলিকাদির লেখাতে স্মৃতিচারণার প্রাধান্য লক্ষ্যনীয়। ভারী সুখপাঠ্য সেসব লেখা। কখনো নিজের ছোটবেলার কথা লিখেছেন, কখনো বিয়ের পর জাপানের শুরু হওয়া প্রবাস জীবন নিয়ে, আবার কখনো বিখ্যাত কোনো ব্যক্তিকে কাছ থেকে দেখে অনুপ্রাণিত হওয়ার কথা, ইত্যাদি। লেখার গুণে সেসব রচনা মনে দাগ কেটে যায়। শৈশবে দেশভাগের সময় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে "বিস্মৃতির অতলে" নামক একটি প্রবন্ধ মঞ্জুলিকাদি লেখেন ২০১৫ সালের অঞ্জলিতে। একটি সুখী পরিবারের ওপর কিভাবে আকস্মিক অশান্তি ও অনিশ্চয়তার কালো ছায়া নেমে এলো, সেই ছবিটি তাঁর লেখায় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। যতবার পড়েছি এই লেখাটিকে আমার একটি ঐতিহাসিক দলিলের মত মনে হয়েছে। লেখার মুন্সিয়ানা ছাড়া পাঠক-মনে এমন গভীর রেখাপাত করা কঠিন।

অঞ্জলির জন্মলগ্ন থেকে শুরু ক'রে দীর্ঘ দু দশকের ওপর প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই লিখেছেন মঞ্জুলিকাদি। শেষ লেখা ২০১৮ সালে পুরনো বন্ধু করবী মুখার্জীর (আমাদের করবীদি) স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মঞ্জুলিকাদি নিজেও তখন খুব অসুস্থ। তবু প্রয়াত বন্ধুকে শেষবিদায় জানিয়েছেন তাঁকে নিয়ে বহু বছরের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করে। এ কাজে মঞ্জুলিকাদিকে সাহায্য করেন তাঁর স্নেহধন্যা শুভা কোকুবো চক্রবর্তী।

অঞ্জলিকে কেন্দ্র ক'রে মঞ্জুলিকাদির সাথে আমার যে যোগাযোগ তাতে আমি অনায়াসেই বুঝতে পেরেছিলাম তিনি লিখতে ভালবাসতেন, বিশেষ করে বাংলায়, কারণ তিনি বাংলা ভাষাটাকে ভীষণ ভালবাসতেন, যেমন ভালবাসতেন বাংলা সংস্কৃতি। দীর্ঘদিনের প্রবাস জীবন, সর্বোপরি জাপানি বাড়ির বধূ হিসেবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে কাটিয়েও এই ভালবাসা তাঁর অটুট থেকেছে শেষ দিন অব্দি। একই সাথে তিনি জাপানি রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতিও পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । দুটি ভিন্ন ধারার সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে সমানভাবে ভালবেসে চর্চা ক'রে যাওয়ার এক অনুপম দৃষ্টান্ত মঞ্জুলিকাদি স্থাপন ক'রে গিয়েছেন।

মঞ্জুলিকাদির লেখার মধ্যে তাঁকে আবার খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্খায় একদিন আমার সংগ্রহে থাকা অঞ্জলির নতুন ও পুরনো সংখ্যাগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। ১৯৯৭ সাল, অঞ্জলি তখন সবে হাঁটি হাঁটি পা পা ক'রে চলতে শুরু করেছে, মঞ্জুলিকাদি সেবার লিখেছিলেন "বারান্দা বিলাস" নামের এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। বারান্দা বা ছাদ কিভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করতো, তা নিয়ে এক মনোগ্রাহী রচনা। লেখায় যে কোনো জিনিস তিনি বর্ণনা করতে পারতেন খুব ভাল, তা সে প্রকৃতিই হোক বা মনের অনুভূতি। প্রকৃতিকে চমৎকার নিরীক্ষণ করতে পারতেন । যা বলতে চান তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত শব্দ চয়নের দারুণ ক্ষমতা ছিল, ছিল ভাষার ওপর পূর্ণ দখল যা না থাকলে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বা মনের প্রতিক্রিয়ার অমন সুন্দর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। লক্ষ্য করেছি রচনার শিরোনামের ব্যাপারেও তিনি ভাবনা চিন্তা করতেন অনেক, এবং মনমতন না হওয়া পর্যন্ত আপোস করতেন না । বেশ কয়েকবার এমনও হয়েছে লেখা টাইপ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার পরেও বার বার টেলিফোন ক'রে শিরোনাম বদলেছেন । অঞ্জলির এখনকার নিয়মিত পাঠকদের অনেকেরই হয়তো ১৯৯৭ সালের সংখ্যাটি পড়ার সুযোগ হয়নি। তাই 'বারান্দা বিলাস' থেকে কয়েক লাইন বেছে নিয়ে এখানে তুলে ধরছি,

"ছোটবেলা থেকে আমি একটু শান্ত প্রকৃতির। গান বই আর লেখাপড়া, এই নিয়ে ছিল আমার নিজস্ব ছোট্ট জগত। তাকে গড়ে তুলতে নানাভাবে সাহায্য করেছে বারান্দা আর ছাদ।

জাপানে আমাদের বাড়ীর বারান্দাটার একটা সুবিধে যে এটা পুরোপুরি কংক্রিটের তৈরি আর একটু ভিতরের দিকে কাত করা বলে সেখানে দাঁড়ালে রাস্তার লোকের চোখে পড়তে হয় না। নিরিবিলিতে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে নিজস্ব সময়টুকু উপভোগ করা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সকাল হতে দেখাটা একটা অভিজ্ঞতা। খুব ভোরবেলা যখন সারা পাড়া নিস্তব্ধ, ঘুমে অচেতন, আকাশের এক কোনে পাণ্ডুর হাসি মুখে চাঁদ শুকতারাকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নেবার অপেক্ষায় কাল গুনছে, তখন সেই শান্ত সমাহিত ভাবের মধ্যে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে পৃথিবীটকে বড় সুন্দর লাগে, ভালো লাগে। জগতের সব সুখ, দুঃখ, ব্যথা বেদনা ভুলে মনটা ডুবে যায় অন্য এক আনন্দে। দেখতে দেখতে একসময় সকাল হয়। সূয্যি ঠাকুর বেরিয়ে আসেন চারিদিক আলো করে"।

২০০৮ সালে মঞ্জুলিকাদি লিখেছিলেন "আগুনের পরশমণি"। এটি একটি গল্প, যার শুরুটা করেছিলেন মনে রাখার মত এক বর্ণনা দিয়ে ----

"বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি! আজ ক'দিন ধরে অঝোর ধারায় ঝরে চলেছে ঝমঝমিয়ে। বলতে গেলে বিরামহীন। যেন পণ করেছে সারা বিশ্ব সংসার ভাসিয়ে দিয়ে তবেই থামবে। কত জল আরও জমে আছে ঐ মেঘের বুকে! এ কি শুধুই বৃষ্টি, নাকি কারুর সব হারানোর হাহাকার ব্যথায়, অভিমানে ঝরে পড়ছে অবিরল জলধারায়? নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে আধশোওয়া হয়ে চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে এই কথাই ভাবছিলেন লাবণ্য, বয়েস তাঁর ৯৫ পেরিয়েছে সবে"।

২০০৯ সালে অঞ্জলিতে মঞ্জুলিকাদির লেখাটা ছিল চিঠির আকারে। নাম "প্রবাসের চিঠি"। লেখাটির উপসংহার পাঠককে জীবন সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবতে উৎসাহিত করে।

"জীবনটাকে অনেক দেখলাম, বুঝলাম, চিনলাম এর মধ্যে। ভাল-মন্দ সবরকম অভিজ্ঞতায় ভরপুর তা। চার্বাকের মতানুসারে যদি এ জীবনটাই শুধু সত্য হয়, তবে আজ কি হিসাব নিকাশের সময় এসেছে --- কি পেয়েছি আর কি পেলাম না, তা খতিয়ে দেখার? কিন্তু মন তো তাতে রাজী নয় একেবারেই।

অতীতচারণ করার আনন্দের সঙ্গে মনের কোনো একটা কোনায় ব্যথাও লাগে এই ভেবে যে কোথায় চলে গেল সেসব দিনগুলি? আর একবার কি পাওয়া যায় না হাতের মুঠোয় সেই আনন্দঘন মুহূর্তগুলিকে? আমাদের গেছে যেদিন, একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি? ---- রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে"।

জুন জুলাইয়ে মঞ্জুলিকাদিকে ফোন করে অঞ্জলিতে লেখার জন্য অনুরোধ জানানো আমার বহুবছরের অভ্যেস। সেই অভ্যেসবশতঃ এবারও মনে হয়েছে মঞ্জুলিকাদিকে একটা ফোন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই ধাক্কা দিয়েছে রূঢ় বাস্তব – না সেই সুযোগ তো আর নেই, হারিয়ে গেছে চিরকালের মত।। ■

কেমন আছ মঞ্জুলিকাদি?

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

ক্রিংক্রিং ক্রিংক্রিং

হ্যালো...

মঞ্জুলিকা হানারি কথা বলছেন?

হ্যাঁ বলছি, আপনি?

আমি শুভা, টয়োটাতে থাকি।

এইতো শুরু। শুধুই শুরু নয়। একটা বিরাট উপকার করলেন একদম প্রথমেই। আর এমন উপকার বিদেশ বিঁভুইয়ে, শুধু বিদেশ কেন নিজের দেশেও কোন অচেনা মানুষের জন্য কেউ করে কিনা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়।

আমি জাপানে এলে জাপানী মতে আমাদের বিয়ে হয়, ওয়ার্ড অফিসে রেজিস্ট্রিও হয়। তার পরের বছর দেশে গিয়ে জাপান ফেরার পথে কোলকাতা এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশনে আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অর্থাৎ আমাকে ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে আরেকবার রেজিস্ট্রি করতে হবে। শুধু জাপানের রেজিস্ট্রেশনে চলবেনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

জাপান ফিরে রেজিস্ট্রেশনের জন্য খবরাখবর করে জানতে পারি রেজিস্ট্রেশনের দিন ধার্য হলে আমাদের টয়োটা থেকে টোকিও যেতে হবে। সাক্ষী হিসেবে আমার আর জুনের পক্ষ থেকে ২জনকে উপস্থিত থাকতে হবে। জুনের দিকের সাক্ষী জোগাড় হয় সাথে সাথেই। মুশকীল হোল আমার দিকের সাক্ষীর।

জুনের সঙ্গে বাড়ির কাছে এক দোকানে কেনাকাটা করতে গেছি। স্বভাবতই আমার পরনে সালোয়ার কামিজ, কপালে টিপ। হঠাৎ একটি মেয়ে দৌড়ে আসে 'তুমি বাঙালী?' ওর সঙ্গে ওর মা বাবাও আছেন। কথাবার্তা চলে কিছুক্ষন দোকানে দাঁড়িয়েই। বাবা টয়োটাতে এক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। কাছাকাছি থাকেন। বাঙালী।

কয়েকদিনের মধ্যেই মঞ্জুলিকাদির খবর জানতে পারি ওনাদের কাছেই। আর তারপর...

রেজিস্ট্রেশনের দিন ঠিক হোল। আমরা টোকিয়ো গেলাম। কুদানশিতা স্টেশনে প্রথম দেখা হোল। আমাদের ভারতীয় রেজিস্ট্রিতে নির্দ্বিধায় সাক্ষী হিসেবে সই করলেন মঞ্জুলিকাদি। আজ এতদিন পরেও সেই প্রথম আলাপের দিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে।

যত দিন যায় আমাদের ফোনালাপও বাড়ে।

পূজোতে শো করতে গিয়ে আগের রাতে মঞ্জুলিকাদির বাড়িতে থেকে দেখেছি পরম যত্নে মিষ্টি তৈরী করতে, পূজোর ফুল ভাগভাগ করে গুছিয়ে রাখতে। 'দেশ' পত্রিকা রেগুলার রাখতেন। নিজের পড়া হয়ে গেলে আমাদের অনেকেরই সুযোগ হোত সেই পত্রিকাগুলো পড়ার। খুব বই পড়তেন। বাংলাভাষাতে অসম্ভব দখল ছিল। অনেকসময় আমার বিভিন্ন লেখায় বানানে সন্দেহ থাকলে মঞ্জুলিকাদির কাছে জানতে চেয়েছি, শুধরে দিয়েছেন। শিল্পপ্রেমিক একটা মন দেখেছি ওঁর মধ্যে। অনেক সময় বিভিন্ন গান নিয়ে, গায়িকার গায়কী নিয়ে আলোচনা করে কেটেছে ফোনে। বিভিন্ন জায়গায় আমার অনুষ্ঠান দেখতে ছুটে গেছেন। শুধু টোকিয়োতেই নয় সাইতামা, শিজুওকাতেও এসেছেন। অনুষ্ঠানের আগে গ্রীনরুমে এসে আশীর্বাদ করে গেছেন।

টয়োটাতে আমাদের বাড়িতে এলেই জুন জমিয়ে গল্প করতো। ভাষার কোন বাধা ছিলনা। বিয়ের সাক্ষী দেওয়া নিয়ে হাসাহাসি হোত খুব। জুন হেসে বলত "আপনি কোন সাহসে যে সই দিতে রাজী হয়েছিলেন, আমি মানুষটা কেমন না জেনেই।" যে ক'দিন এখানে থাকতেন গল্প হাসি ঠাট্টা আনন্দে কেটে যেত দিনগুলো।

আজ লিখতে বসে কত কথা যে মনে আসছে। খুব ধুমধামের মধ্য দিয়ে আনন্দদার(মঞ্জুলিকাদির স্বামী) ৮০বছরের জন্মদিন পালন হয়েছিল। আনন্দদা- মঞ্জুলিকাদির 'টোকিয়ো যোগ সেন্টার'এর ছাত্রছাত্রীরা বিরাট আয়োজন করেছিলেন। সেদিন আমিও নৃত্য পরিবেশন করেছিলাম জন্মদিনের উপহার হিসেবে।

টোকিয়োর বাড়ি শিফ্‌ট হোল। নতুন বাড়ি চিবাতে। বারবার যাবার জন্য বলেন। এতো বাড়ি নয়, হলিডে-রিসোর্ট। গাছ, ফুল ইত্যাদির প্রতি মঞ্জুলিকাদির অসম্ভব ভালবাসার কথা অনেকেই জানেন। মনের মত করে সাজিয়েছিলেন রুফ টেরাস। আনন্দদা তখন ডে-সার্ভিসে যান সকালে। তার আগে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গাছ দেখতে দেখতে কত গল্প আড্ডা।

বার্দ্ধক্যজনিত কারনে টুকটাক অসুস্থতা চলছিল প্রায়ই। আনন্দদা চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। মঞ্জুলিকাদি ভীষন একা হয়ে গেলেন। শরীরের চাইতেও মনের জোরটা একদম কমে আসছিল। আবার বাড়ি শিফ্‌ট করে টোকিয়োতে। মাঝেমাঝেই অসুস্থতা। কয়েকবছরের মধ্যে নিজের ইচ্ছেতেই বৃদ্ধাশ্রমে। টয়োটা আর টোকিয়োর দূরত্ব এতটাই বেশি, ইচ্ছে থাকলেও সবসময় যেতে পারিনি। তোমার কাছে যাবো বললেই এত খুশি হোতেন। প্ল্যান করতেন, তাহলে আমি এখানে বলে রাখবো আমরা একসাথে ডিনার করবো। কখনও খাবার কিনে নিয়ে ঘরে বসে খাওয়া, তাও হোত।

পূজোর ম্যাগাজিনের লেখা লিখছি আর বারবার গতবছরের কথা মনে পরছে। মঞ্জুলিকাদির কথাটা এভাবে এত তাড়াতাড়ি সত্যি হয়ে যাবে মনেও আসেনি তখন। BATJর পূজোর ম্যাগাজিনে (অঞ্জলি) প্রতিবছর মঞ্জুলিকাদির লেখা পড়ে এসেছি। গতবছর হাতের এবং চোখের সমস্যার জন্য অল্পস্বল্প সাহায্য করে দিচ্ছিলাম লেখাতে। বলছিলেন সামনের বছর আমি যখন থাকবনা, তখন আমাকে নিয়েও লেখা হবে। কী যে বলো তুমি, বলে চুপ করিয়েছিলাম।

২০১৯য়ের জানুয়ারীতে মুম্বাই পুনেতে আমার গ্রুপ নিয়ে অনুষ্ঠান করতে যাবার কথাবার্তা চলছিল অনেকদিন ধরেই। এবার একটু বেশিদিনের জন্য যাওয়া। তাই তার আগে একবার মঞ্জুলিকাদির সঙ্গে দেখা করে আসবো ভেবে জানালাম। খুব খুশি হলেন। বললাম দুপুরে আমরা একসাথে খাবো, কি খেতে চাও বল, আমি কিনে নিয়ে যাবো। বললেন আমাকে কিন্তু খাইয়ে দিতে হবে, বাচ্চাদের মত বললেন ম্যাক্‌ডোনাল্ড্স'এর ফিলেটো ফিশ। আমি বললাম যদি না পাই তাহলে আরেকটা অপশন দাও। তাহলে টুনা ওনিগিরি। বেশ তাই হবে। স্টেশনে নেমে খোঁজ করে বার্গার পেলামনা। অগত্যা ওনিগিরি, স্যুপ ইত্যাদি নিয়ে মঞ্জুলিকাদির কাছে। মনটা বড্ড খারাপ হয়েছিল সেদিন। একি অবস্থা? হাত-পা-মাথা কিছুই নড়ানোর কোন ক্ষমতা নেই সেদিন। একভাবে বসে আছেন। তারমধ্যেই একগাল হাসি আমাকে দেখে। আস্তে আস্তে টুনা ওনিগিরি আর স্যুপ খাইয়ে দিলাম। আমার ক্লাসের তাড়া, আমি ফিরে এলাম। আসার আগে প্রনাম করে বললাম অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি ভারতে, আশীর্বাদ কর যাতে সফল হয়ে ফিরতে পারি। ফিরে আবার আসবো তোমার কাছে। সাবধানে থেকো।

...ছিড়িলো বীণার তার, ছিল আশা গাবো গান, গাওয়াতো হোলনা আর...

তারপর.....ভারতে বসেই জাপানের এক বন্ধুর ফোন...মঞ্জুলিকাদি আর নেই। গলাটা আট্‌কে আসছিল...বড় প্রিয় একজন অভিভাবককে হারালাম।

তুমি যেখানেই আছো, শান্তিতে থেকো। আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম মঞ্জুলিকাদি। ■

স্মৃতিটুকু থাক

- চন্দ্রিমা কুন্ডু

এটা একটা গাছের গল্প। না ঠিক গাছের নয়, বরং বলা ভাল গাছের মধ্যে বেঁচে থাকা একজন মানুষের গল্প।

আমি যখন তাঁর সান্নিধ্যে আসি তখন আমার বয়স ২৪ আর উনি প্রায় ৬০এর ঘরে। বয়োজ্যেষ্ঠা মানুষ হলেও টোকিওর বাঙালী পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর নামের সাথে 'দিদি' শব্দ যোগ করে 'মঞ্জুলিকাদি' বলে লোকে আমাকে চিনিয়ে দেয়। বিয়ের পরে স্বামীর কাজের সূত্রে আমার টোকিওতে আসা। ভারতীয়রা যেখানে যায় সেখানে পূজা-পার্বণ, আড্ডার জায়গা বা বন্ধুবান্ধব খুঁজে না নিলে তাকে আর যাই হোক ভারতীয় বলা যায় না। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলাম বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশন অফ টোকিও জাপান বা বি,এ,টি,জে'র। সেখানেই আলাপ মঞ্জুলিকাদির সঙ্গে। আলাপ হয়েছিল আরও অনেকের সাথে। একসাথে এত নতুন মানুষের সাথে আলাপ হলে কি সবাইকে মনে রাখা সম্ভব? আমি তখন সবার মধ্যে নতুন মুখ। তাই অন্যান্যরা আমাকে মনে রাখলেও, আমার পক্ষে সবাইকে মনে রাখা বেশ কঠিন ছিল।

আমি যে সময় টোকিওতে আসি তখন পশ্চিমা দেশগুলির তুলনায় ভারতীয়ের সংখ্যা জাপানে বেশ কম ছিল। ভাষার সমস্যা তার অন্যতম একটি প্রধান কারণ। তাই যারা আসত তাদের অধিকাংশ কর্মসূত্রে মাত্র কয়েক বছর কাটাত এই দেশে। বহু বছরের বাসিন্দা হাতে গুনে কয়েকটি পরিবার। তাই আলাপ করার সময় মঞ্জুলিকাদি যখন বললেন, "আমি তো ৩৭ বছর হল টোকিওতে আছি", তখনই মনের হার্ড ডিস্কে ঐ কথাটা নোট হয়ে গিয়েছিল, আর মনে জন্ম নিয়েছিল ওনার সম্পর্কে জানার আগ্রহ। ষাটের দশকে এক জাপানীকে (আমাদের শ্রদ্ধেয় আনন্দদা) বিয়ে করে মঞ্জুলিকাদির টোকিও শহরে আগমন। শুনেই আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। আমার মা জেঠিমার আমলের মানুষ। সেকালে অধিকাংশ ভারতীয় মেয়ে বাবা মায়ের ঠিক করে দেওয়া পাত্রকে বিয়ে করত আর নিজের শহর বা কাছাকাছি কোনও শহরে গিয়ে সংসার করত। সেই যুগের মহিলা হয়ে এমন একজন বিদেশী যার মাতৃভাষা পর্যন্ত ইংরাজী নয় তাঁকে বিয়ে করে দূর দেশে এসে সংসার করছেন! তখন আমার মনোভাব ছিল ইংরেজ হলেও বুঝি সংসার করা সহজ। এমন এক মহিলা যিনি যুগের থেকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে চলেছেন তাঁর কাহিনী স্বাভাবিক ভাবেই মনে গেঁথে গেল।

প্রথম বছর মঞ্জুলিকাদির সাথে দেখা হয় দুবার। সরস্বতী পূজা আর দুর্গাপূজার বহু দায়িত্ব থাকত তাঁর ওপর। হবেই তো, বয়োজ্যেষ্ঠা মানুষ, তার ওপর পরিশ্রমী। তাছাড়া মঞ্জুলিকাদির দায়িত্ব নিতেও আপত্তি ছিল না। দুর্গাপূজাতে পেয়েছিলাম তাঁর হাতে তৈরি ছানার মিষ্টি আর নারকেলের সন্দেশ। সেইসব দিন ছিল আলাদা। জাপানে বাড়ীতে কেউ এত ভাল মিষ্টি বানাতে পারে সেই ধারণা আমার ছিল না তখনও। একেবারে কলকাতার মিষ্টির দোকানের মিষ্টির মত স্বাদ। কোথা থেকে শিখেছেন, কিভাবে বানিয়েছেন এত কথা আলাপ হওয়ার পরপরই জিজ্ঞেস করা সমীচিন নয় বলে চোখেমুখে কিছু বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই দেখাইনি। কিন্তু অন্যের মনের কথা উনি পড়তে পারতেন। তাই বললেন, "চিন্তা কোরো না, কিছুদিন বাদে তুমিও পারবে"। কি অদ্ভুত মাতৃসুলভ ব্যবহার! আর তাও কি না স্বল্প পরিচিতা মেয়ের সঙ্গে। জানি পারবো না ওরকম মিষ্টি বানাতে, তবু এক অদ্ভুত ভাল লাগায় ভরে গেল মন।

এক বছর বাদে গেলাম কলকাতায় পরিবার পরিজনের সাথে দেখা করতে। সবাই জানতে চাইছে নতুন দেশ, আমার নতুন সংসার আর নতুন গড়ে ওঠা বন্ধু ও পরিচিতদের সম্পর্কে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে মঞ্জুলিকাদির গল্প করিনি এমন লোক কমই ছিল। সবাইকে মঞ্জুলিকাদির সাহসিকতার গল্প করেছি। হ্যাঁ আমার কাছে, ঐ যুগে যখন ইন্টারনেট তো দূরের কথা টেলিফোনের যোগাযোগটাও সহজসাধ্য ছিল না, তখন অল্প পরিচিত এক যুবকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের দেশ ছেড়ে ভাষা না জানা অচেনা এক দেশে পাড়ি দেওয়াটা চরম সাহসিকতা বলেই মনে হয়েছিল।

দিন কাটতে লাগল আর টোকিওতে চেনাপরিচিত বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা বাড়তে থাকল। পূজা পার্বণ ছাড়াও অন্য জায়গায় দেখা হওয়া, ফোনে কথা, এসব গেল বেড়ে। একটি টেলিকম কম্পানিতে কাজের সুবাদে মঞ্জুলিকাদির সাথে মাঝে মাঝেই অনেক কথা হত। ঐ কম্পানির ইন্টারন্যাশনাল কলিং কার্ড ব্যবহার করে উনি দেশে সকলের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। কথায় কথায় লক্ষ্য করতাম দেশের প্রতি, দেশে ফেলে আসা আত্মীয় পরিজনের প্রতি এতকাল পরেও কি অদ্ভুত টান। সম্পর্ক গভীর হতে থাকল। গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে জানতে পারতাম অনেক কথা। তাঁর মুখেই শুনেছি পরিবারের বয়স্ক মানুষ যাদের শ্রবণশক্তি ছিল কম তাঁদের জন্য লিখতেন চিঠি আর বিজয়ার পর প্রত্যেকের জন্য শুভবিজয়ার চিঠি। অবাক হতাম আর ভাবতাম কি করে পারেন সব কিছু একসাথে সামলাতে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি মঞ্জুলিকাদি শুধুই যে গৃহবধু ছিলেন তা নয়, স্বামী আনন্দদার যোগব্যায়াম কেন্দ্রের কাজেও তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

এরই মধ্যে আমার সংসার বাড়তে থাকল। সন্তানের জন্মের আগে থেকে এবং তারপর যখন তারা বড় হচ্ছে সেই সময় প্রতি পদক্ষেপে মঞ্জুলিকাদির কাছ থেকে পেয়েছি অনেক উপদেশ। সন্তানকে বড় করার অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, ভিন্ দেশে সম্মুখীন হওয়া বহু প্রতিকূলতাকে কিভাবে জয় করতে হয়, সেসব ব্যাপারে ছিল তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা। তাই বহু সমস্যার সমাধান পেয়েছি তাঁর কাছে। দিদি বলে ডাকলেও মঞ্জুলিকাদি ছিলেন আমার মায়ের মত। নিজের মায়ের সাথে তাঁর নানারকম তুলনা মনে এসেই যেত। বিদেশে থাকার সুবাদে আর যোগব্যায়ামের সাথে যুক্ত থাকার জন্য শারীরিক সুস্থতা মনে হয় আমাদের দেশের ঐ বয়সের মহিলাদের থেকে বেশী ছিল। অথবা মনোবলের জন্যেও হতে পারে, মঞ্জুলিকাদিকে অনেক বেশী শক্ত মানুষ বলে মনে হত আমার।

ওনার স্নেহ ভালবাসার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময়কার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ না করলে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সম্পর্ক গভীর হয়ে ওঠার জন্য কি না জানিনা, আমরা কয়েকটা পরিবার প্রতি দুর্গাপূজাতে মঞ্জুলিকাদির কাছ থেকে নিয়মিত কিছু উপহার পেতাম। তাতে থাকত হরেক রকমের টুকিটাকি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। আবার কখনও ভারত থেকে আনা পোশাক আষাক। আর পূজার দিনে নিজে হাতে গড়া সন্দেশ, মিষ্টি তো উপরি পাওনা। ভিনদেশী স্বামী ও পুত্রকন্যাদের দুর্গাপূজা সম্পর্কে তেমন উৎসাহ না থাকায় সাধারণত প্রতিবছর একাই যোগদান করতেন এবং আমাদেরই পরিবারের সদস্য হয়ে যেতেন। মন্ডপে নিয়ে যাওয়া, রাত্রে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া, এসব ছিল ওনার স্নেহধন্যা মেয়েদের কাজ। ভীষণ উপভোগ করতেন বাংলা গান, নাটক ও নাচের অনুষ্ঠান। এরই মাঝে মঞ্জুলিকাদি এবং কয়েকটি রবীন্দ্রপ্রেমী পরিবারের উৎসাহে শুরু হয় ঘরোয়া রবীন্দ্র জয়ন্তী। পূজাপার্বণ ও ভারতীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। আবার অন্যদিকে জাপানী স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর কাছ থেকে শেখা জাপানী সংস্কৃতি ও রীতিনীতি মেনে চলতেন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে। মঞ্জুলিকাদির জাপানি শ্বশুরবাড়ীর অনেক গল্প তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি। শ্রদ্ধা আর ভালবাসার সাথে শোনাতেন তাদের কথা। ভাষা না জানা এক বিদেশিনী কন্যাকে কত সুন্দরভাবে আপন করে নিয়েছিলেন তারা। অবাক লাগত গল্পগুলো শুনে। যেন একেবারে সিনেমার গল্প। আমি বলতাম নিজের একটা জীবনী লিখে ফেলনা কেন? শুনে শুধু হাসতেন।

মঞ্জুলিকাদির চিবার বাড়ীতে আমরা গিয়েছিলাম। বাড়ীর সবথেকে আকর্ষণীয় জায়গা ছিল ছাদের বাগান। নিজে হাতে তৈরী বাগান, নিয়মিত যত্নের ছোঁয়া ছিল তাতে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরের নানা সমস্যা শুরু হয় আনন্দদার। বাধ্য হয়ে সেই বাড়ী বিক্রি করে মঞ্জুলিকাদির মেয়ের বাড়ীর কাছে টোকিওতে বাড়ী কিনে তাঁদের চলে যেতে হয়। তখন দেখা দিল এক সমস্যা। আগের তুলনায় ছোট বাড়ীতে আগের বাগানের অত গাছ রাখার জায়গার অভাব। আমার মত সাধারণ মানুষের কাছে এটা কোনও সমস্যাই নয়। কিন্তু যাঁর কথা লিখছি তিনি তো সাধারণের দলে পড়তেন না। গাছপালাকে সন্তানের মত লালন পালন করতেন। তাই কোন গাছ কাকে দিলে যত্নের অভাব হবে না, সেই নিয়ে ওনার চিন্তা আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোসের কথা আমরা সবাই পড়েছি, তবে মঞ্জুলিকাদির মত গাছপ্রেমী মানুষকে আমি চাক্ষুষ দেখেছি।

টোকিওর বাড়ীতে যাওয়ার পর ওনাদের নানা সমস্যা শুরু হয়। আনন্দদার শরীর দিনে দিনে খারাপ হতে থাকে। মনমরা হয়ে পড়েন মঞ্জুলিকাদি। নিজের সন্তানদের কাছে যেমন মানুষ দুঃখের কথা ভাগ করে নেয় ঠিক সেইভাবেই নিয়মিত টেলিফোনে নিজের নানা সুবিধা অসুবিধার কথা বলতেন। ওদিকে আমার কলকাতার বাড়ীতে আমার বাবা মায়েরও শুরু হয়েছিল বার্ধক্যজনীত সমস্যা। আমি আর আমার দিদি তখন দুজনেই থাকি বিদেশে। নিজের মা বাবার সমস্যার সাথে মঞ্জুলিকাদির অনেক মিল

পেতাম। দুই বাড়ীতেই ফোন করে সান্ত্বনা দিতাম।

এখনও মনে পড়ে আনন্দদার মৃত্যুর সময়ের কথা। মঞ্জুলিকাদির মত শক্ত মানুষের অসহায় হতাশ অবস্থা দেখে কি বলব ভেবে পাই না। একাকীত্ব কি জিনিস তা বুঝতে পারি ওনার অবস্থা দেখে। সুদূর বিদেশে আপনজনকে হারিয়ে মানসিক অবস্থা কি হয় সেটা খুব কাছ থেকে দেখেছি এই সময়। কখনও মনে হয়েছে উনি দেশে ফিরে গেলে তো পারেন। ওনাকে বললে উনি উত্তর দিতেন, "এটাই তো আমার দেশ"। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম মেয়েদের স্বামীর ঘরকেই নিজের ঘর বলে শেখানো হয় আমাদের দেশে।

এদিকে আমার কলকাতার বাড়ীতেও ঘনিয়ে আসে দুর্যোগ। বাবা চলে গেলেন হঠাৎ করে। কোনও রোগ নেই কিছু নেই। এ যে কি হয়ে গেল! মায়ের নানান শারীরিক সমস্যা। বাবাই মাকে দেখাশোনা করতেন। হঠাৎ দুর্যোগে আমরা ভেঙে পড়লাম, কিন্তু মা নিজের শারীরক অবস্থা আর আমাদের বিদেশ বাসের কথা চিন্তা করে নিজের ভবিষ্যৎ ঠিকানা নিজে স্থির করলেন --- বৃদ্ধাশ্রম। কারোর নিষেধ শুনলেন না। মানসিক নানা দুশ্চিন্তা নিয়ে বাবার শেষকাজ সম্পন্ন করে ফিরলাম টোকিওতে।

আমার প্রবাস জীবনে কখনো কোনও বিদেশিনীর কাছে একটা কথা শুনেছিলাম। মানুষ যদি কারোর কাছ থেকে ভাল কিছু পায়, তাকেই যে সেটা ফেরত দিতে হবে, তা নয়। পরিবর্তে অন্য কারোর জন্য ভাল কিছু করলে সেটা ফেরৎ যায় ঐ মানুষটার কাছে অন্য কারোর মাধ্যমে। কথাটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম। আমি খুব সাধারণ স্বার্থপর প্রকৃতির মানুষ। তাই নিজের মায়ের জন্য কিছু করতে না পারার অনুতাপে মঞ্জুলিকাদির দরকারে তাঁকে সাহায্য করতে শুরু করে দিলাম। এই বিশ্বাসে যে ওটা ফেরত যাবে আমার মায়ের কাছে অন্য কারোর মাধ্যমে।

একাকীত্ব আর বার্ধক্য ক্রমশ দুর্বল করে দিতে থাকল মঞ্জুলিকাদিকে। শক্ত স্বাভাবিক মানুষ থেকে খুব দ্রুত শারীরিক ক্ষমতাহীনতার শিকার হতে শুরু করলেন। তবে মন ও মাথা ছিল ভীষণ সতেজ। ক্রমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে আসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। তবে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে নিজেকে সবসময় সজাগ ও ওয়াকিবহাল রাখতেন। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার অদম্য ইচ্ছা দেখেছি মানুষটার মধ্যে। এই সময়ে কোনও দরকারে ওনার বাড়ী গেলে যদি নিজে খাবার বানিয়ে নাও দিতে পারতেন, বাইরে থেকে অর্ডার করে আনাতেন, অতিথি সেবায় ত্রুটি রাখতেন না।

এই সময়ে মঞ্জুলিকাদির স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছিল খুব দ্রুত। হাত আর পায়ের জোর এত কমে গেল যে একা তাঁকে বাড়ীতে রাখা বিপদজনক হয়ে পড়ল। ওনার পুত্রকন্যাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক বৃদ্ধাশ্রমে ওনাকে পাঠান হবে বলে জানতে পারলাম। নিজের অবস্থা বিবেচনা করে উনিও এই সিদ্ধান্তে মত দেন। কিন্তু সমস্যায় পড়লেন ওনার সন্তানসম গাছগুলিকে নিয়ে। উনি যেভাবে এগুলির দেখাশোনা করেন সেই দায়িত্ব কাকে দেবেন? আবার ঘরে এদের ফেলে যেতেও মন চাইছিল না। জাপানের মত দেশ যেখানে সবার বাড়ীতেই সীমিত জায়গা সেখানে কোনও একজনের বাড়ীতে সব গাছ পাঠানোও সম্ভব নয়। সে সময়ে ওনাকে ফোন করলে ঐ শারীরিক অবস্থাতেও গাছেদের নিয়ে ওনার চিন্তা দেখে আর অবাক হইনি, বরং উনি যে সাধারণের বাইরে এক অসাধারণ আত্মা সেই বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হয়েছিল।

ঘরের সব আসবাবপত্র ফেলে, চেনা অচেনা মায়া পরিত্যাগ করে ২০১৭ সালের শেষ দিনে তিনি চলে গেলেন তাঁর নতুন ঠিকানায় --- বৃদ্ধাশ্রমে। কোনও মানসিক দুশ্চিন্তা কিন্তু তাঁকে তাঁর কর্তব্য থেকে সরাতে পারেনি। খুব কম সময়ে তিনি তাঁর গাছেদের এবং সংগ্রহের বাংলা বইগুলোকে নিজ হাতে এমন এমন জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন যেখানে তাদের যত্ন আর সম্মানের কোনও ত্রুটি থাকবে না। ওনার চলে যাওয়ার আগের দিন ঘটনাচক্রে আমি পৌঁছেছিলাম ওনার টোকিওর বাড়ীতে। শেষের "জবা" গাছটা পেয়েছিলাম আমি আর তাঁর সাথে আনুসঙ্গিক কিছু জিনিস।

সত্যি কথা বলতে কি, গাছ বা প্রাণীদের ভালবাসিনা তা নয়, কিন্তু তাদের যত্ন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান বা অনেক আগ্রহ আমার ছিল না। মঞ্জুলিকাদির কথা চিন্তা করে আমি গাছটিকে নিয়ে এসেছিলাম আর তাতে নিয়মিত জলও দিয়েছি। কিন্তু কেন জানিনা গাছটাতে ফুল আর আসতো না। তাই যখন মঞ্জুলিকাদির সাথে ফোনে কথা হত, কখনও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গাছটার সম্বন্ধে তাঁকে বলতে পারতাম না।

এদেশের অনেক নতুন জিনিস ও অজানা রীতিনীতির সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল মঞ্জুলিকাদির হাত ধরে। এদেশের বৃদ্ধাশ্রমের সাথেও পরিচয় হল আবার ওনারই হাত ধরে। আমার মায়ের আশ্রমের সাথে তুলনা এসে যেত মনে। অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্রের সুব্যবস্থা আছে এখানকার আশ্রমে। কিন্তু একজন বিদেশীর কাছে নিজের ঘর মনে করার মত পরিবেশ কতটা ছিল বলতে পারব না। মঞ্জুলিকাদিকে দেখেছি আপ্রাণ চেষ্টা করতে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার। যে মহিলা জীবনের শুরুতেই বিদেশকে নিজের দেশ বানিয়ে নেওয়ার সাহস ও শক্তি দেখাতে পেরেছেন, তাঁর কাছে এই পরিবেশে মানিয়ে নেওয়াটা নিশ্চয়ই বিশেষ কষ্টের হবে না। কিন্তু আশ্রমে তাঁর দিন যত কাটতে থাকল আমার মনে হতে লাগল পরিবেশ, আচার ব্যবহার, খাবার দাবার ও চাল চলনের এত পার্থক্যের মধ্যে জীবনের শেষ দিনগুলি, বিশেষ করে মানুষ যখন ভীষণ ভাবে একা হয়ে পড়ে, তখন কাটানো বেশ কষ্টকর।

মঞ্জুলিকাদির আশ্রমের খাবার ছিল সম্পূর্ণ জাপানী পদ্ধতিতে বানানো স্বাস্থ্যকর খাবার। তবু সেই খাবার রোজ খেতে কোনও ভারতীয়েরই হয়তো ভাল লাগবে না। অনেক দিন মনে হয়েছে ওনার জন্য কিছু বাঙালী খাবার বানিয়ে নিয়ে গেলে ভাল হয়। কিন্তু খাবারের অনিয়মে যদি শরীর খারাপ হয়, সেকথা চিন্তা করে আমি পিছিয়ে এসেছি। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ একদিন আশ্রমে গিয়ে হাজির হলাম ওনার সাথে দেখা করতে। যেহেতু চিরকালই গাছ ও ফুলের প্রতি মঞ্জুলিকাদির ভালবাসা বেশী, তাই কিছু ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম। নানা কথাবার্তা ও গল্প চলতে থাকে। এই সময়ে কেউ দেখা করতে গেলে মঞ্জুলিকাদি খুব উত্তেজিত হয়ে অনেক কথা বলতেন। নানা কথার মধ্যে দেশের খাবার খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমি কথা দিলাম খুব শিগ্‌গিরি আগে থেকে জানিয়ে খাবার তৈরী করে নিয়ে যাব আশ্রমে। আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী বাইরে থেকে খাবার আনলে আগেভাগে জানাতে হয়। ওনার হাতের জোর খুব কমে যাওয়ার দরুন ফিরে আসার আগে ওনার ঘরে থাকা কিছু খাবার আমি নিজে হাতে ওনাকে খাইয়ে দিয়ে আসি। এটাই ছিল ওনার কাছে আমার শেষ প্রাপ্তি। মনে হল টোকিওতে বসেও যেন নিজের মায়ের জন্য কিছু করলাম।

পারিনি কথা দিয়ে কথা রাখতে। দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যস্ততায় কোথা দিয়ে দিন কেটে যায়। রোজই ভাবতাম আর দু এক সপ্তাহ কাটলেই একটু সময় হবে আর আমি রান্না করে ওনার জন্য নিয়ে যাব। কিন্তু ওনার হাতে সময় ছিল আমার থেকেও কম। একদিন খবর এলো ওনার শরীর খুবই খারাপ। হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সেখান থেকে মঞ্জুলিকাদি আর ফিরলেন না। মানুষের একটা চিরপরিচিত স্বভাব হল নিজের দোষ আর কারোর ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে শান্তি পাওয়া। কিন্তু মঞ্জুলিকাদির শেষবিদায়ের খবরটা পাওয়ার পর আমি এমন কাউকে পাইনি যার ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে ভাবতে পারবো ওর দোষে আমার মঞ্জুলিকাদিকে খাওয়ানো হল না। মঞ্জুলিকাদির সামান্য শেষ ইচ্ছাটুকুও পূরণ করতে পারলাম না।

বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশন থেকে জানানো হল মঞ্জুলিকাদির শেষকাজের দিন ও সময়। ঐ সময়ে উপস্থিত হয়ে আমরা ওনাকে শেষ দেখা দেখতে পারব। দিনটা ছিল শনিবার। সকালে চোখ খোলার পর ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখি টক্‌টকে একটা লাল জবা ফুটে রয়েছে ঐ জবা গাছটিতে। যেহেতু গাছটিতে ফুল ধরত না তাই কখন যে কুঁড়ি এসেছে তা লক্ষ্যও করিনি। কিন্তু আজই কেন? আর কিছুদিন আগে ফুটলে তো মঞ্জুলিকাদিকে জানাতে পারতাম। কিন্তু প্রকৃতি তো আমার ইচ্ছা অনুসারে চলবে না। কত কিছুই যেন অপূর্ণ রয়ে গেল।

জাপানের অত্যাধুনিক ব্যবস্থায় মঞ্জুলিকাদির দেহটিকে খুব সতেজ করে রাখা হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন। সত্যিই যদি তাই হত। আমার না বলা কথাগুলো যদি বলতে আর শেষ ইচ্ছেগুলো যদি পূর্ণ করতে পারতাম। বিদায়বেলায় সবার চোখে জল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিচিত দেশী বিদেশীতে ভরে ছিল ঐ প্রাঙ্গন। আর আমি মনে মনে চিৎকার করে ক্ষমা চাইছিলাম। মন থেকে কেউ যেন বললো জবা গাছটার যত্ন নিতে।

এখন আমি নিয়মিত জবা গাছটার যত্ন নিই। গাছটিতে এখন নিয়মিত ফুল ধরে। ছেলের ইচ্ছা আমি যেন ঐ ফুল তুলে ঠাকুরকে না দিই। তাই গাছের ফুলগুলো ফোটে, আবার প্রকৃতির নিয়মে ঝরেও যায়।। ■

আমাদের মঞ্জুলিকাদি

- চৈতালি পাল, প্রীতিকণা সরকার

এই তো গত ডিসেম্বরের কথা। গত বারের পুজোর অঞ্জলির এক কপি নিয়ে গিয়েছিলাম মঞ্জুলিকাদির সাথে দেখা করতে। পাশে বসে অঞ্জলির পাতা ওলটাতে ওলটাতে কথা হচ্ছিলো করবীদিকে নিয়ে লেখা ও ছবির সম্বন্ধে। হঠাৎই মঞ্জুলিকাদি বললেন, "দেখিস পরের বার আমাকে নিয়ে লেখা বের হবে"। শুনে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিলো। ভাবিনি যে কথাটা এমন করে সত্যি হয়ে যাবে। ওনার সাথে প্রায় ১৮ বছর আগে পরিচয়ের শুরু। সেই থেকে অনেক স্মৃতি, আনন্দঘন মুহূর্ত, কত কথা ভিড় করে আসছে মনে। আমি জাপানে ২০০১ এর জানুয়ারিতে আসি। মঞ্জুলিকাদির সাথে বিএটিজের একটি অনুষ্ঠানে প্রথম দেখা হয়। সেখানেই জানতে পারি যে উনি জাপানী (আনন্দদা) বিয়ে করে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে আছেন। শুনে বেশ অবাক হয়ে ভাবছিলাম এ তো কোনো দুঃসাহসিক অভিযান থেকে কম নয়। তারপর আরো দেখা, ফোনে কথা, বাড়িতে যাতায়াত। ধীরে ধীরে সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠলো। তাঁর উরায়াসুর বাড়ির সুন্দর টেরাসে বসে হানাবি দেখা, আবার ওই বাড়িতেই আমার সাধের অনুষ্ঠান। সবই চিরদিন মনে রাখার মতো ঘটনা। যখন উরায়াসু থেকে আদাচির বাড়িতে গেলেন তখন আমাদের বাড়িতে কিছু সপ্তাহ ছিলেন। সেই দিনগুলো খুব মজার ছিল। তিয়াস তখন বেশ ছোট, কিন্তু তাতে দুজনের গল্পগুজবে কোনও খামতি ছিল না। রোজ সন্ধ্যেবেলাতে তিয়াসের উদ্যোগে টি পার্টি, অবশ্যই তিয়াসের পছন্দের মুগি চা, কুকিস আর ফ্রুতস থাকতো যেটা মঞ্জুলিকাদি ভীষণ এনজয় করতেন। আর আমরা তিয়াস আর মঞ্জুলিকাদির এই দিদা নাতনী সম্পর্কটা এনজয় করতাম।

কারণে অকারণে উপহার দিতে খুব ভালোবাসতেন। টোকিওতে বেশ কয়েকজন ছিল তাঁর স্নেহের উপহারের প্রাপক আর আমি ছিলাম তাদের একজন। তাঁর উপহারগুলো আমার কাছে গুরুজনের আশীর্বাদ স্বরূপ।

জীবনের শেষ কয়েক বছর, যখন বাড়ি আর হাসপাতালের মাঝে বাঁধা ছিলো সময়টা, তখন অনেক বেশি কাছের মানুষ হয়ে ওঠার সৌভাগ্য হয়েছিল। আনন্দদার অসুস্থতা আর তারপর চলে যাওয়া .. এই সব কঠিন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে পাশে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। শেষের দু-তিন বছর নিয়মিত মঞ্জুলিকাদির সাথে দেখা করাটা আমাদের একরকম রুটিন ছিল। কখনও কিছু পছন্দের খাবার রান্না করে বা প্রয়োজনীয় সামান্য টুকিটাকি জিনিস নিয়ে গেলে কি ভীষণ খুশি হতেন, সেই আনন্দে ঝলমল মুখটা এখনও চোখে ভেসে ওঠে। বাংলায় নির্ভেজাল আড্ডা দিয়ে খুব আনন্দ পেতেন আর তাই কারোর আসার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

আমার মায়ের সাথে মঞ্জুলিকাদির একটা সুন্দর হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল, ঠিক দুই বোনের মতো। মা যখনই টোকিওতে আসতেন মঞ্জুলিকাদির সাথে অবশ্যই দেখা করতেন। টোকিওতে মা থাকাকালীন ফোনে দীর্ঘ সময় কথা বলা, এমনকি কলকাতা থেকেও ফোনে খোঁজ খবর চলতো দুজনের। তাই আমার এই লেখার শেষে রইলো মঞ্জুলিকাদি সম্পর্কে আমার মায়ের কিছু কথা .....

মায়ের (প্রীতিকণা সরকার) কথা .....

জানি না কোথা থেকে শুরু করবো ও কোথায় শেষ করবো। এই মায়াময় সংসারে আবদ্ধ, শোক দুঃখে মুহ্যমান হয়েও বেঁচে থাকতে হয়। ইহলোক পরলোকের এই যাতায়াত থাকবেই, এটাই চিরন্তন সত্য। এই সত্য অতিক্রম করা যায় না।

মঞ্জুলিকাদির সাথে আমার পরিচয় টোকিওতে ২০০৭ সালে মেয়ে জামাইয়ের (চৈতালি এবং বিশ্বনাথ) বাড়িতে বেড়াতে এসে। প্রথম দেখাতেই মনে হয়েছিলো একজন স্নেহশীলা মমতাময়ী দিদি। ক্রমে আমাদের সখ্যতা বাড়তে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, কখনো আমার মেয়ের বাড়িতে দেখাসাক্ষাত বাড়তে থাকলো। আমার ওনার সাথে কথা বলতে, সময় কাটাতে ভীষণ ভালো লাগতো কারণ কোথাও কোথাও আমাদের দুজনের ভাবনা চিন্তাতে খুব মিল ছিল। এটাই বোধ হয় পরস্পরকে ভালো লাগার মূল কারণ ছিল। নিয়মের গতিতে আমাকে একদিন ভারতে ফিরতে হল। তারপর শুরু হল ফোনের মাধ্যমে কথোপকথন। একজন জাপানী বিয়ে করে এখানে আসার অভিজ্ঞতা, তাঁর দীর্ঘ সংসার জীবনের ওঠাপড়ার গল্প, জাপানী রীতিনীতি এসব নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা চলত। আমি ওনার থেকে অনেক দেশ বিদেশের গল্পও শুনেছি। উনি একবার আমার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করে ছিলেন যে ভারতে গেলে আমার হাতে করা কুমড়ো ফুলের বড়া আর পুঁইশাকের চচ্চড়ি খাবেন, কিন্তু সে ইচ্ছে আর পূর্ণ হলো না।

মঞ্জুলিকাদির স্বামীর অসুস্থতা ও চলে যাওয়ার খবর পেলাম। একবার জাপান আসার সময় প্লেনে মঞ্জুলিকাদি ও আনন্দবাবুর সাথে দেখা হয়েছিলো। সেই প্রথম আনন্দবাবুর সাথে আমার আলাপ। স্বামীর অবর্তমানে ওনার মানসিক ও শারীরিক অবনতি আমাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল। তারপর ২০১৮র ডিসেম্বরে দেখা, ওনাকে দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছিল। এতটা শারীরিক অবনতি আমি ভাবতে পারিনি। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও প্রায় ঘণ্টা খানেক কথা হয়েছিল। বাড়ি ফিরে আসার সময় সজল নয়নে আমার মাথাতে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "প্রীতি, তোমার আমার হয়তো এই শেষ দেখা"। কথাটা এত তাড়াতাড়ি সত্যি হয়ে যাবে ভাবিনি। মঞ্জুলিকাদির সাথে আমাদের যে গভীর হৃদ্যতা তা ওনার চলে যাবার পরেও শেষ হওয়ার নয়। তাঁর স্মৃতি, কথা, হাসি, গল্প চিরদিন আমাদের সাথে থাকবে।

কী ভয় অভয়ধামে

- ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত)

মঞ্জুলিকাদি, তোমার মনে আছে গতবছর ঠিক এই সময় যখন বিএটিজে থেকে অঞ্জলিতে লেখা পাঠানোর ইমেল পেলাম, জানলাম যে আমি করবীদির স্মরণে লিখব, সেই সময় প্রায় রোজই তোমার সাথে কথা হোত। তুমিও লিখতে চাও, কিন্তু তোমার হাত অচল, তাই শুভা ফোনে শুনে লিখে নিচ্ছে তোমার মনের কথা। প্রায় প্রতিদিনই তুমি বলতে "এবছর করবীর জন্য লেখো, আগামী বছর আমার জন্য লিখবে"। এত বেশী করে এই কথাটা বার বার বলেছো কীভাবে? এখন ভাবি তুমি এতটা নিশ্চিতভাবে কি জানতে যে এবছর তুমি আনন্দদার কাছে চলে যাবে? এতটা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেছো, তাহলে কি তোমার অন্তরাত্মা তোমাকে নোটিস দিচ্ছিল যে "আর নাইরে বেলা"।

মঞ্জুলিকাদি জানো, আমার মোবাইল ফোনের হোয়াটস্ অ্যাপ'এ তোমার নামটা আমি রেখেই দিয়েছি, মুছিনি। কারণে অকারণে যখন চোখে পড়ে তখন মনে হয় তুমি আছো, শুধু ফোনকলটা পাই না বা মেসেজটা আসে না। শেষবারের মত মেসেজ ছিল আমার --- ৩১/০১/২০১৯ "আমি আজ ভারত যাচ্ছি, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ফিরবো"। আর তোমার উত্তর যথারীতি, "ভাল করে ঘুরে এসো"। তুমি প্রতিদিন হয় একটা ফুলের গাছ বা গুচ্ছের ছবি, না হলে গান বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অথবা কোনো মহামানবের উক্তি পাঠাতে। যদি এর উত্তর না পেতে, মেসেঞ্জারে লিখতে এবং যদি তাতেও আমার জবাব না থাকতো তাহলে ঠিক ফোন আসতো "আজ কি তোমার শরীর ঠিক নেই"? কতবার যে প্রশ্ন করেছো "বিশ্বকে আবার জাপানে পাঠাবে না? ওদের কি ট্রান্সফার নেই? তোমাদের আবার কবে দেখবো"? ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা জাপান থেকে চলে আসার সময় তুমি এও বলেছিলে যে, "এইবার বুঝতে পারবো মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে গেলে কেমন লাগে"। শুধু আমাকে নয়, মুনকেও (শ্রীমতী শর্ব্বরী সেনগুপ্ত, ভাইঝি)। মুনের সাথে পরিচয় তো তোমারই জন্য। আমার হাতে ওর জন্য উপহার, চিঠি ও অন্যান্য জিনিস পাঠালে। আমাকে ওর ফোন নম্বর ও ঠিকানা দিয়ে বলেছিলে, "মুন ভারী প্রাণবন্ত মেয়ে আর খুব প্রেরণা দিতে জানে। ওর সাথে মিশলে তুমি আনন্দ পাবে"। তোমার কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি। গত দু বছরে ওর সাথে তিন চার বার দেখা হয়েছে আর ফোনে কথা হয় প্রায়ই। খুবই ভাল লাগে ভাবতে যে এর যোগসূত্র তুমি।

রোজই তো তোমার সাথে মনে মনে কথা বলি বা চিঠি লিখি। কি জানি সেসব চিঠি তোমার কাছে পৌঁছোয় কি না। তবে এটুকু জানি যে তুমি যেখানেই থাকো আমাদের জন্য শুভকামনাই করছো ও করবে। এতবার ইচ্ছে করে কথা বলি বা গলাটা শুনি, কিন্তু আটকে যাই। তোমার এখনকার বাসা কোনখানে তা তো জানা নেই। নাহলে নিশ্চয়ই ফোন করে নিতাম। শেষের দিকটায় তুমি যেরকম শারীরিক অবস্থায় ছিলে সেটা আমি স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি। আমি জানি ঐ অবস্থায় বেঁচে থাকাকে জীবন বলে না। তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হোত, তাই তুমি শরীর ত্যাগ করে মুক্তির পথে পাড়ি দিলে আনন্দদার সাথে দেখা করবে বলে। আমরা তোমাকে যতই খুঁজে বেড়াই তুমি এখন সেসব মায়াবন্ধনের ঊর্দ্ধে। তাই মনে মনে তোমাকে চিঠি লেখা বা তোমার কথা ভাবা ওইটুকুই আমাদের পক্ষে সম্ভব। আচ্ছা মঞ্জুলিকাদি, তুমি কি ওখানেও ভারত ও জাপানের মিলন ঘটিয়েছো? খুব জানতে ইচ্ছে করে। আজ এখানেই রাখি। আবার চিঠি দেব কেমন? প্রণাম নিও ও ভাল থেকো ----

ভাস্বতী